ধ্বনি

কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ধ্বনিবাদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শুধু সংস্কৃত কাব্যের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা কাব্যবিচারে এই ধ্বনিবাদের প্রয়োগ কিভাবে ও কতখানি চলতে পারে তাও বিচার্য বিষয়। ধ্বনিবাদ রসবাদের বিরোধী না হয়ে তা রসবাদেরই পরিপূরক হওয়ায় - - ধ্বনিবাদ বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে সকল অলংকারিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ধ্বনিবাদের প্রথম প্রবর্তক কে, তা ঠিক বলা যায় না। 'ধ্বন্যালোক' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক এক অমূল্য সম্পদ। গ্রন্থটি চারটি 'উদ্দ্যোত'এ (পর্ব) বিভক্ত। প্রত্যেক 'উদ্দ্যোত'-এর দুটি অংশ ক, কারিকা ও খ, বৃত্তি। কবিতায় আছে কতকগুলি 'সূত্র' -কবিতার আকারে লেখা 'বৃত্তি'-তে কারিকা সূত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে গদ্যে। দশম – একাদশ শতকের কাশ্মীরীয় মহাচার্য অভিনব গুপ্ত 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের টীকা লিখেছেন। এর নাম 'লোচন টীকা'। ঐ সূত্র ও বৃত্তি দুয়েরই বিস্তৃত ভাষ্য দেওয়া হয়েছে টীকায়। 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের কারিকা' ও বৃত্তি' একই ব্যক্তির রচিত কিনা এ নিয়ে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেন। গ্রন্থের 'বৃত্তি' অংশ যে মনীষী আনন্দবর্ধনের রচনা এতে কোনো সন্দেহ নেই – কিন্তু 'কারিকা' অংশ তাঁর লেখা কিনা – তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আনন্দবর্ধনের পূর্ববর্তী কোনো লেখকের রচিত 'কারিকা' অংশেরই তিনি বৃত্তি যোজনা করেছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। অভিনব গুপ্তের 'লোচনটীকা'র মধ্যেই এমন কিছু কিছু মন্তব্য আছে যাতে 'কারিকা' ও 'বৃত্তি' যে একই ব্যক্তির লেখা নয় - এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে কারিকা ও বৃত্তি দুইই – একই ব্যক্তির লেখা এবং তিনি আনন্দবর্ধন।

কাব্যবিচারে ও কাব্যের আস্বাদনে ধ্বনিবাদের স্থান বাংলা কাব্যে বিশেষ করে আধুনিক বাংলা কাব্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। ধ্বনিবাদিদের মতে কাব্যের আত্মা হচ্ছে ধ্বনি – 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরীতি'। ধ্বন্যালোক গ্রন্থের 'কারিকা' কারকে যদি 'ধ্বনিকার' বলি, তাহলে বলতে পারি ধ্বনিকার উল্লিখিত ধ্বনিবাদকে সুন্দরভাবে যুক্তি সহকারে কাব্যত্রারূপে প্রতিষ্ঠিত আচার্য আনন্দবর্ধন।

যে শক্তির দ্বারা শব্দ সাক্ষাৎভাবে সংকেতিত অর্থকে বোঝায়, কিংবা মুখ্য অর্থকে বোঝায় তাকে বলে অভিধা - শক্তি। আর এই অভিধা শক্তির সাহায্যে শব্দটির যে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে তাকে অভিধেয় অর্থ, বাচ্যার্থ বা শব্দার্থ বলে। অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো বাক্যের অন্তর্গত কোনো একটি শব্দের অভিধেয় বা বাচ্যার্থের দ্বারা সেই শব্দটির প্রকৃত অর্থ বোঝা যাচ্ছে না – যেমন, 'তিনি এখন রবীন্দ্রনাথ পড়ছেন' – এই বাক্যের রবীন্দ্রনাথ শব্দটির অর্থ হল একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক মানুষটিকে তো পড়া সম্ভব নয়। তাই এখানে অর্থ করতে হবে 'রবীন্দ্রনাথের লেখা সাহিত্য'। এখানে শব্দের অভিধা-শক্তি তার মুখ্যার্থকে বুঝতে বাধা দিচ্ছে। যখন অভিধাশক্তি শব্দের মুখ্যার্থকে বুঝতে বাধা দেয় তখন যে শক্তির সাহায্যে নিয়ে অভিধা বা বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দটির প্রকৃত অর্থকে আমরা বুঝে থাকি – তাকে বলে লক্ষণা শক্তি। এই লক্ষণা দু'রকমের। রূঢ়ি লক্ষণা ও প্রয়োজন লক্ষণা।

'রূঢ়ি' শব্দের অর্থ 'লোকপ্রসিদ্ধি' 'কলিঙ্গ সাহসিক' বা 'ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক' – বললে মুখ্যার্থের দিক থেকে অর্থ বুঝতে অসুবিধে হয়। একটি দেশ সাহসিক বা আধ্যাত্মিক হতে পারে না। তাই এর লক্ষ্যার্থ হল, 'কলিঙ্গ দেশবাসী' বা 'ভারতবর্ষবাসী' কলিঙ্গ দেশবাসী বা 'ভারতবর্ষবাসী' বোঝাতে শুধু কলিঙ্গ বা ভারতবর্ষের ব্যবহার হয়েছে। এটি লোক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ বলে 'রূঢ়ি'। তাই এ দুটি 'রূঢ়ি' উদাহরণ। এখানে, কোনো প্রয়োজন

Scanned with CamScanner

সিদ্ধ হয়নি তাই কলিঙ্গ না বলে কলিঙ্গ দেশবাসী বললেও চলত।

প্রয়োজন লক্ষণাই প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধি লক্ষণা। এর উদাহরণ – তিনি গঙ্গায় বাস করেন। এখানে গঙ্গা শব্দের অর্থ একটি প্রসিদ্ধ জলস্রোতবাহী নদী। এই অর্থের সঙ্গে বাক্যটির অন্য শব্দার্থের অন্বয় করলে যে অখণ্ড অর্থটি মনে জাগে, তা বিশ্বাস নয়, কারণ গঙ্গার মধ্যে কেউ বাস করতে পারে না। সেইজন্য অর্থ করতে গিয়ে মন বাধা পেয়ে 'গঙ্গা' শব্দের এমন অর্থ খোঁজে যার সঙ্গে বাক্যের বাকী শব্দগুলির অন্বয়ে কোনো বাধা আসে না। আবার 'গঙ্গা' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অর্থই খুঁজতে হবে। আর সে হল 'গঙ্গাতীর'। তিনি 'গঙ্গাতীরে বাস করেন' – একথা না বলে 'তিনি গঙ্গায় বাস করেন' – একথা বলার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। গঙ্গার তীরে বাস করার জন্যে গঙ্গার শৈত্য, পাবনত্ব প্রভৃতি তিনি লাভ করে থাকেন। 'গঙ্গায়' না বলে 'গঙ্গাতীরে' বললে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হত না। 'গঙ্গায়' শব্দ 'গঙ্গাতীরে' বুঝিয়ে লক্ষণার কাজ শেষ করল। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন শৈত্য, পাবনত্ব প্রভৃতি গোপন সূক্ষ্ম অর্থের ইঙ্গিত – এটি ব্যঞ্জিত অর্থ। এটিই লক্ষণামূলক ধ্বনি। বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দ পরস্পর সম্মিলিত অন্যান্য শব্দগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্বয়বোধের দ্বারা যখন একটি অখণ্ড অর্থকে প্রকাশ করে, তখন তার নাম তাৎপর্য। আর যে শক্তির সাহায্যে এই অন্বয়বোধ একটি সম্পূর্ণ অর্থকে গোচর করে তার নাম তাৎপর্য শক্তি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে শব্দের অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপর্য এই তিন শক্তি। আর বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও তাৎপর্যার্থ – এই তিন রকম অর্থ। ধ্বনিবাদীরা দেখালেন শব্দের ঐ তিনশক্তি বা অর্থের দ্বারা কাব্যসৌন্দর্য কখনোই সৃষ্ট হয় না। তাছাড়া এই তিনশক্তি এক হিসেবে বাচ্যার্থকেই প্রকাশ করে। লক্ষণার যে লক্ষ্যার্থ তা তো বাচ্যার্থেরই একটুখানি প্রসারিত অর্থমাত্র। সেই অর্থের ইঙ্গিত করেই লক্ষণা বিশ্রান্তি লাভ করে। তাৎপর্যার্থে বাচ্যার্থকেই সামগ্রিকভাবে বোঝানো হয়।

ধ্বনিবাদিরা জানালেন যে বাচ্যার্থের পথে কাব্যত্বের সন্ধান মিলবে না। কাব্যের কাব্যত্বকে উপলব্ধি করতে গেলে শব্দের আর একটি শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। এ শক্তি তাদেরই আবিষ্কার। শব্দের এই চতুর্থ শক্তির নাম ব্যঞ্জনাশক্তি। একে ব্যঙ্গ শক্তিও বলে। কাব্যের বাচ্যার্থ কোনোরকমে বাধা না পেয়ে যখন নিজ স্বরূপে প্রকাশ পাবে অথচ ঐ বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে পাঠক পাঠিকার চিত্তে (সহৃদয় সামাজিকের) একই সময়ে আরো একটি অর্থ প্রতীয়মান হবে, তখন সেই অর্থটিকে বলা হবে ধ্বনি। আর যে শক্তির দ্বারা এই ধ্বনি অর্থকে পাওয়া যাবে তার নাম ব্যঞ্জনাশক্তি বা ব্যঙ্গ শক্তি। ধ্বনি অর্থটিকে প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গার্থ বলে। ধ্বনিবাদের সমর্থকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন প্রতিটি শ্রেষ্ঠ কাব্য বা কাব্যাংশে বাচ্য অর্থের অতিরিক্ত আর একটি প্রতীয়মান অর্থ থাকে। এ যেন নারিদেহের লাবণ্য। নারীদেহের লাবণ্য যেমন নীরদেহকে আশ্রয় করে থাকলেও দেহাতিরিক্ত জিনিস, কাব্যশরীরকে আশ্রয় করে থাকলেও ধ্বনি অর্থ সেই রূপ অতিরিক্ত কাব্যলাবণ্য। ধ্বনিকার বলেছেন, "মহাকবিদের বাণী কিন্তু আর একটি বস্তু আছে যার নাম প্রতীয়মান অর্থ। তা রমণীর লাবণ্যের মতো চিরপরিচিত অঙ্গ-সৌষ্ঠব থেকে পৃথকভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে"।

এই প্রতীয়মান অর্থটি বাচ্যার্থের দ্বারা আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হয়। ঘন্টাধ্বনি থেমে গেলেও যেমন তার অনুসরণ কিছুক্ষণ চলতে থাকে, তেমনি সহৃদয়ের চিত্তে বাচ্যার্থ আসার পর তারই সূত্রে নূতন আর একটি সূক্ষ্ম স্পন্দন উঠতে থাকে। এই অর্থই প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গার্থ। ইংরেজিতে একে Suggested sense বলা হয়। এ কেবলমাত্র ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, শেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবিদের বাণীতেই দ্যোতিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমেই একটি সংস্কৃত শ্লোক ও তার বঙ্গানুবাদ দিতে পারি –

"এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।

লীলাকমল পত্রাণি গণসমাস পার্বতী।

কুমার সম্ভব ৬/৮৪

Scanned with CamScanner

বঙ্গানুবাদ..... "অঙ্গিরা যবে কহিল একথা, পিতার পাশে পার্বতী নতাননী।"

দেখিতে লাগিল লীলাকমলের দলগুলি গণি গণি।। — বাচ্যার্থ এখানে স্পষ্ট। দেবর্ষি অঙ্গিরা পিতা হিমালয়ের কাছে যখন পার্বতীর বিবাদের কথা বললেন, তখন অধোমুখে পার্বতী হাতের লীলাকমল গুণতে লাগলেন। এই বাচ্যার্থ থেকে ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা পাওয়া গেল তাঁর 'অবজিখা' নামক ব্যাভিচারী বা সঞ্চারী ভাবটিকে। এর বিভাব-লজ্জা', অনুভাব — 'আনত মুখ এবং লীলা পদ্মদল গণনা' — তাই এটি ভাব ধ্বনি আনন্দবর্ধন ব্যভিচারী ভাব — প্রাধান্য সম্বলিত এটিকে সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি বলেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রেষ্ঠ কাব্য নিজের বাচ্যার্থকে জানিয়েই শেষ হয় না। তা বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করবেই। এই বাচ্যাতিরিক্ত বিবক্ষিতান্য ধর্মান্তরের ব্যঞ্জনাই হল ধ্বনি। আনন্দবর্ধন এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে – যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই বলেছেন ধ্বনি"।

Scanned with CamScanner